DECLARATION

I, Debabrata Roy, bearing registrtion No. Ph.D/1426/2011, Dated 11.04.2011, hereby declare that the subject matter of the thesis entitled ''জীবন ও সাহিত্যের সমান্তরাল পাঠ ঃ নারীর আত্মজীবনী'' (A Parallel study of life and literature : Women's Autobiography) is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other university / Institute.

This thesis is being submitted to Asam university for the degree of Dector of Philisophy in Bengali.

(**Debabrata Roy**)
Department of Bengali,
Assam University, Silchar-788o11

Date :
Place :

প্রাক কথন

প্রতিটা জীবন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আর সেই জীবন অভিজ্ঞতা যখন কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ হয়ে আসে তখন ব্যক্তির হয়ে ওঠার এক চিত্তাকর্ষক পাঠ নির্মিত হয়। তার সাথে সমাজ ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিকতা বর্জিত বহুমাত্রিক পরিচয়টিও পরিস্ফুট হয়। আমাদের সমাজের পিতৃতান্ত্রিক আবহে নারীর জীবনচর্যা বরাবরই অবরোধের বেড়াজালে ঘেরা। অবরোধের শৃঙ্খল লঙ্ঘন করে নারী যখন আত্মকথনে ব্রতী হন তখন তাঁর চোখে সমাজকে নতুন করে চেনা যায়। একই সময়ে অবস্থান করেও সমাজের অর্ধেক ভাগীদারদের জীবনকে যে পৃথক সূত্রে গাঁথতে হয় আমাদের আশ্চর্য করে। তাই বলতেই হবে সমাজ ইতিহাসের সুচারু পাঠ নারীর আত্মকথা ব্যতিত সম্ভব নয়।

রাসসুন্দরী দাসী (১৮০৯-১৯০০)র হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মজীবনী রচনার যে ধারাটির সূচনা হয়েছিল বিশ শতক আসতে আসতে সেই ধারাটি অনেকটাই পরিপুষ্টি লাভ করেছে। সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাত-অখ্যাত বাঙালি মেয়েরা আত্মকথা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁদের চিন্তা-চেতনা, জীবনচর্যার নবনব পাঠ রচনা করে সমাজের অনালোকিত পরিসরগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন। নারীর আত্মজীবনী আজকের জ্ঞান সাধনার জগতে বিশেষ চর্চার বিষয়ও হয়ে উঠেছে। স্নাতক স্তরে পড়াকালীন বাঙালি মেয়েদের আত্মকথামূলক রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছিলাম। বাঙালি মেয়েদের আত্মকথামূলক রচনাগুলি নিয়ে লেখক, গবেষকদের বিশ্লেষণাত্মক পাঠগুলি এ বিষয়ে আমার আগ্রহকে আরও বৃদ্ধি করেছিল। আগ্রহটি যে নিতান্তই ক্ষনিকের জন্য ছিল না তা বুঝতে পারলাম, স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পর গবেষণার বিষয় নির্বাচনের

সময় বাঙালি মেয়েদের আত্মকথামূলক রচনাগুলির কথাই সর্বপ্রথম মাথায় এলো। যাইহোক বাঙালি মেয়েদের নির্বাচিত কয়েকটি আত্মকথামূলক রচনার বিশ্লেষণাত্মক অধ্যায়নের লক্ষ্য নিয়ে ২০১১ সালে গবেষণার প্রস্তাব নিবেদন করি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই গবেষণার সূত্রে আত্মজীবনীকারদের অন্যান্য রচনা আমরা অধ্যায়ন করেছি। নির্বাচিত আত্মজীবনীকারদের আত্মজীবনীগুলি অধ্যয়নের পাশাপাশি সমসাময়িক আত্মজীবনীকারদের, উনিশ শতকের আত্মজীবনীকারদের আত্মজীবনীগুলি। তাঁদের আত্মজীবনী নিয়ে লেখক, গবেষকদের বিভিন্ন আলোচনা আমরা অধ্যয়ন করেছি। এই গবেষণা কর্মে বিভিন্ন দুঃষ্প্রাপ্য বই ও লিটিল ম্যাগাজিনগুলি পেয়েছি, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার; আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার; যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি ওম্যান স্ট্যাডি বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার; লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা; ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি গ্রন্থাগার, কলকাতা; গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, কলকাতা; দ্বিজেন্দ্র ডলি মেমোরিয়্যাল লাইব্রেরী, শিলচর গ্রন্থাগারগুলি থেকে। কাজটি শুরু থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে যে ব্যক্তি আমাকে সর্বাধিক সহায়তা ও সাহস জুগিয়েছেন তিনি আমার অভিভাবক তুল্য তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক দূর্বা দেব। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা এখানে পর্যাপ্ত নয়।

লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু, ছবি বসু, অনুরূপা বিশ্বাস ও জয়া মিত্র আত্মজীবনীকারদের আত্মজীবনী দেখার বোঝার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়ায় অনেকজনের লেখাপত্র এবং সাহচর্য আমাকে সাহায্য করেছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রমা ভট্টাচার্য, বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বেলা দাস, অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক শান্তনু সরকার ও

অধ্যাপক রাহুল দাসের নাম। এছাড়া বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যপিকাদেরও জানাই কৃতজ্ঞতা। আর একজন ব্যক্তির নাম অবশ্যই করতে হয় তিনি হলেন শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, কলকাতা ডেভিডহেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অনিত রায় স্যার। তাঁর সাহায্যে গবেষণা কর্মটির দিশা পেয়েছিলাম। নিজের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ব্যবহারের সুযোগও তিনি করে দিয়েছিলেন।

যে আত্মজীবনীকারদের আত্মজীবনী নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করলাম, তাদের মধ্যে লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু, ছবি বসু আমাদের কাজ শুরু করার পূর্বেই ইহজগতের মায়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাইনি। তবে প্রতিভা বসুর কন্যা দময়ন্তী বসুর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। ছবি বসুর কন্যা শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীর কাছে ছবি বসুর দুষ্প্রাপ্য লেখাপত্র পেতে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি। নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করেও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন। গবেষণা কর্মটি শুরু করার পর আত্মজীবনীকারদের মধ্যে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম অনুরূপা বিশ্বাসের সঙ্গে। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে ঘন্টাখানিকের কথপোকথনের সুযোগ ঘটে ছিল। নিজের অসুস্থতার মধ্যেও তিনি আমার প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন। এই আশ্চর্য মানবীকে কাছে পেয়ে কৃতার্থবোধ করেছিলাম। সাক্ষাৎকার পর্বটির অল্প দিনের মধ্যে তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে যান তখন ভিষণ হতাশ লেগেছিল। অনুরূপা বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাতকারের সময়ই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম জায়া মিত্রের ফোন নম্বর ও বাড়ির ঠিকানা। সেই সূত্র ধরে জয়া মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। গবেষণা কর্মের বিভিন্ন সময়ে প্রযোজন অনুসারে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাতৃতুল্য তিনি এখানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নিষ্প্রয়োজন।

গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যেতে বাবা-মা পরিবারের কাছ থেকে সহচর্য পেয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি। সেই সঙ্গে বন্ধুদের সাহায্যের কথাও ভোলার নয়।

বিমলদা, কিশোরদা, মৃত্যুঞ্জয়দা, বকুল, গোবিন্দ এরা সকলেই আমার গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যেতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

শেষে বলি আমার গবেষণায় প্রাসঙ্গিক তথ্য যথাযত ব্যবহারের চেষ্টা করেছি আমি, তথাপি কিছু তথ্যও ছাপার ভুল আমার নজর এড়িয়ে রয়েই গেল। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১০-২১
প্রথম অধ্যায়-	২৪-৮৫
লীলা মজুমদারের আত্মজীবনী ঃ ‘পাকদণ্ডী’	
দ্বিতীয় অধ্যায়-	৮৮-১১০
প্রতিভা বসুর আত্মজীবনী ঃ ‘জীবনের জলছবি’	
তৃতীয় অধ্যায়-	১১৩-১৫৮
ছবি বসুর আত্মজীবনী ঃ ‘ফিরে দেখা’	
চতুথষ্টঅধ্যায়-	১৬১-১৮৫
অনুরূপা বিশ্বাসের আত্মজীবনী ঃ ‘নানা রঙের দিন’	
পঞ্চম অধ্যায়-	১৮৮-২৩৭
জয়া মিত্রে আত্মজীবনী ঃ ‘হন্যমান’	
উপসংহার	২৩৯-২৪২
গ্রন্থপঞ্জী	২৪৪-২৫২

ভূমিকা

ভূমিকা

অতীতকে অস্বীকার অসম্ভব। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা বর্তমান প্রজন্ম তথা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে যেমন সমাজ বিবর্তনের গতি ধারার পরিচয় তুলে ধরে তেমনি সমাজের অতীত ঐতিহ্যকে করে প্রকট। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের বিবরণী থেকে অনেক সময়ই সমাজের অন্তর্লোকের পরিচয় উঠে আসেনি। তার সাথে ব্রাত্য থেকেছে প্রান্তবাসী মানুষদের পরিচয়। আত্মজীবনী সাহিত্য ধারা সেই অভাব অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছে তার বিশেষ বৈশিষ্টের সূত্রে। আত্মজীবনী সাহিত্য ধারায় লক্ষ্য করা যায় একজন ব্যক্তি মানুষ স্বীয় জীবনের বিবরণ দান করে। পাশ্চাত্য আত্মজীবনী সাহিত্যের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক জার্মান পণ্ডিত জর্জ মিশের ভাষায়–

"It can be defined by summarizing the term, 'autobiography' implies the description (grapkia) of an individual human life (bios) by the individual him self (auto)."[১]

এই স্বীয় জীবন হল যা তাঁর একান্তই আত্মার আত্মীয়। তাই আত্মবিশ্লেষণ আত্মজীবনীর মৌল প্রেরণা। এ যেন অনেকটা নিজেকেই পুনরাবিষ্কার করা যে আবিষ্ক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে স্বীয় জগৎ ও জীবন। অর্ন্তজগৎ ও বর্হিজগতের মধ্যে নিজেকে অন্বেষণই নয়, উভয়ের মধ্যে ঐক্য সূত্রে সামঞ্জস্য বিধান ও তার কর্তব্য। জর্জ মিশের মতে-

"Though essentially representations of individual personalities, autobiographers are bound always to be

representative of their period, within a range that will vary with the intensity of author's participation in contemparary life and with the sphere in which the moved."[২] তবে, ব্যক্তি বিশেষের বোধ ও বোধির গাঢ় বদ্ধতা এবং তারতম্যের ওপর আত্মজীবনীর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

আত্মআবিষ্কারের সূত্রে আত্মজীবনীকারের মধ্যে দ্বৈত সত্তা ক্রিয়াশীল থাকে। এক ব্যক্তিসত্তা যে নিজের প্রাণপুরুষকে প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত করতে চায়। দুই সামাজিক সত্তা-যা বস্তু জগতের সঙ্গে সাধ্যমত অন্বয় সাধনে ব্রতী হয়। উভয় সত্তার মধ্যেই আবার বস্তু নিরপেক্ষতা এবং বস্তু সাপেক্ষতা যুগপৎ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। আত্মজীবনী তত্ত্বের অন্যতম বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ রয় পাসকাল এর ভাষায়- *"The autobiographer has in fact a double character. He exists to some degree as an object, a man recognisable from autside, a man recognisable from outside, and he needs to give to some extent the genetical story of this person. But he is also the subject, a temperament whose inner and outer world owes its appearance to the manner in which he sees it".*[৩] ভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে বলা যায়, প্রকৃত জীবনের পটভূমিকায় আমার অন্তর্নিহিত *'আমি'* কে পরিস্ফুট করা সার্থক আত্মজীবনীর ধর্ম। সেই মৌল ধর্মের প্রতি প্রদর্শনের কথা মনীষী রুশো 'confessions' আত্মজীবনী গ্রন্থে এভাবে বলেছেন– *" The real object of my confessions is to communicate an exact knowlege of what I interiorly an and have been in every situation of my life."*[৪]

আত্মজীবনী মূলতঃ আত্মজিজ্ঞাসারই নামান্তর। স্বীয় আত্মজীবনীতে এইচ

জি ওয়েলস লিখেছেন– *"that is not an apology for life but a research into its nature."*[৫] আত্মজীবনীতে এই গবেষণা তথা আত্মানুসন্ধানপরতা ক্রমেই একটি বিশেষ জীবনতত্ত্বে উন্নীত হয় যা কখনই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হয়না। রয় পাসকেল লিখেছেন-- *"The purpose of true autobiography must be "sellestlesiming," a search for one's inner standing. It si an affain of conscience, and in its immediate source and purpose suggeste something of a metaphysical urge, or at any rate something that can not be reduced to a rational of or social function."*[৬]

আত্মজীবনী সাহিত্য ধারার মত ব্যক্তি জীবন নির্ভর সাহিত্য ধারা হল স্মৃতিকথা, ডায়েরী ও চিঠিপত্র। তবে এই সাহিত্য ধারাগুলির সঙ্গে আত্মজীবনীর পার্থক্য রয়েছে। দেশ-কাল-পাত্রের সীমায় আবদ্ধ যে ব্যক্তিত্ব, তারই সম্যক বিকাশ ও উত্তরণ প্রদর্শিত হয়ে থাকে আত্মজীবনীতে। আত্মজীবনী তাই ঘটনার, ব্যক্তিবর্গের, ইতিহাসের বা দৈনন্দিন জীবনের নিছক তথ্যপঞ্জী নয়। অথচ, স্মৃতি কথার মূল লক্ষ্যই তাই। আত্মজীবনীতে আত্মজীবনীকার চলমান জগৎ ও জীবনের অন্যতম সহযাত্রী মাত্র। আর স্মৃতিকথায় ব্যক্তিমানুষ আপন ব্যক্তিসত্তাকে প্রকট না করেই ঘটনা, ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস, দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ দানের চেষ্টা করেন। তবে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা দুটি সাহিত্য ধারাতেই একে অপরের সীমারেখাকে লঙ্ঘনের প্রয়াস লঙ্ঘিত হয়। রয় পাসকেল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন- *"The line between autobiography and memoir or reminiscence is much harder to drow-or rather, no clear line can be drawn. There is no autobiography that is not in some respect a memoir, and no memoir that*

without autobiographycal in formation; both are based on personal experience, chronological, and reflective."

[৭] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'স্বরচিত জীবনচরিত'* (১৯১৮) কে আত্মজীবনী বলা হলেও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *'কল্লোল যুগ'* (১৯৫০), পবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের *'চলমান জীবন'* (১৯৫২), সজনীকান্ত দাসের *'আত্মস্মৃতি'* (১৯৫৪) প্রভৃতিকে স্মৃতিকথা বলে রায় দিলেও তাদের মধ্যে আত্মজীবনীকারের অস্তিত্বের অভাব বলা যায় না। তবে সবশেষে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় আত্মজীবনীতে স্মৃতিকথার মেলবন্ধন ঘটলেও এবং স্মৃতিকথাতে আত্মজীবনীকারের আদর্শ সংযুক্ত হলেও আত্মজীবনী সাহিত্যে ব্যক্তিসত্তার আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টাই মুখ্য হয়। আর স্মৃতিকথায় আত্মানুসন্ধান মুখ্য না হয়ে বিবৃতিদানই প্রাধান্য পায়।

আত্মজীবনী সাহিত্য ধারার নিকট আত্মীয় অপর সাহিত্যধারাটি হল ডায়েরী। ডায়েরী একান্তই লেখকের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপঞ্জী। এখানে তাই লেখক-স্বপক্ষের সওয়াল জবাব নিজেকেই শোনান। নিজেকে নিয়েই তাঁর বৃত্ত। তাই বিষয়টি সূত্রাকারে রচিত হয়। তবু, সাহিত্যে তার গুরুত্ব নগন্য নয়। ডায়েরীতে লেখকের মানস গঠন, কর্ম বা সৃষ্টিকাণ্ডের অনেক মৌল উপাদানই লিপিবদ্ধ থাকে। লেখকের ব্যক্তিগত জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সম্যক্ পরিচয় লাভে ডায়েরী অনেক সময়েই নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থের ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, দৈনিক লিখিত হয় বলে বা দীর্ঘদিনের ব্যবধানে রচিত হয়না বলে ডায়েরী স্মৃতি বিভ্রম ঘটায় না। উপরন্তু, ডায়েরীতে অনেক বিষয়বস্তুই যা একান্ত পলল স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে- পরবর্তীকালে তাকেই আবার পল্লবিত অবস্থায় শিল্প সাহিত্যের কোন না কোন বলিষ্ঠ শাখায় উন্নীত হতে দেখা যায়। বিশ্ব সাহিত্যে তাই ডায়েরীর এত সমাদর। তথাপি ডায়েরী প্রতি দিনের ভাব, ঘটনাও কার্যক্রমের দিন লিপি বলে প্রাত্যহিকের তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা ক্ষেত্র বিশেষে কালোত্তীর্ণ হতে পারে

না। যার কর্মই দৈনিক, দ্রুততা তার ধর্ম হতে বাধ্য। সে জন্য তার তাৎক্ষণিক দ্রুত সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই নির্ভুল বা শিল্প সম্মত হয় না এবং ডায়েরী থেকে ব্যক্তি জীবনের সামগ্রিক নীতি-আদর্শের সাক্ষ্য পাওয়া অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী' প্রবন্ধ থেকে ডায়েরী সম্পর্কিত তাঁর অভিমতের উল্লেখ করা যায়– *"আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়েরী লিখে যেতুম, তাহলে তাতে করে হোত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তাহলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।"* [৮] ডায়েরী সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আত্মজীবনী সাহিত্য ধারার কাছাকাছি অবস্থান করলেও একজন ব্যক্তি জীবনের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুটনে ডায়েরীর তুলনায় আত্মজীবনী সাহিত্যধারা অনেক বেশী কার্যকরী।

আত্মজীবনীর সাহিত্য ধারার মতই নিজের জগৎ জীবনের পরিচয় প্রদান ও আত্মবিশ্লেষণের প্রেরণা লঙ্ঘিত হয় চিঠিপত্রে। চিঠিপত্রের প্রত্যক্ষ দু'টি পক্ষ, দাতা এবং গ্রহিতা। সে কারণে গ্রহীতার শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও মানসিকতার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয় পত্রদাতাকে। বলা যায় পত্ররচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা গ্রহিতাই সৃষ্টি করেন। সে কারণে স্বীয় জীবন ও জগতের পরিচয় প্রদানের যে স্বাধীনতা আত্মজীবনী সাহিত্যে রয়েছে চিঠিপত্রে সেই অর্থে নেই। লেখকের অন্তরঙ্গ ভাব-ভঙ্গি অনুসন্ধানে চিঠিপত্র পাঠক তথা গবেষক অনেকাংশে সাহায্য করলেও আত্মজীবনী সাহিত্যে সেই সম্ভাবনা অনেক বেশী মাত্রায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় *'ছিন্নপত্র'-তে* রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগৎ ও জীবনচর্চার একটা পরিচয় উঠে আসলেও তাঁর *'জীবন স্মৃতি'* গ্রন্থটির ব্যাপকতা এর তুলনায় অনেক অধিক।

প্রত্যক্ষ ব্যক্তি জীবন নির্ভর সাহিত্য ধারার বাইরে– ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য প্রমুখ সাহিত্যধারাগুলিতেও আত্মজীবনী সাহিত্যধারার মত লেখকের জীবন, আদর্শ তথা জীবনচর্যা প্রতিবিম্বিত হয়। উপরন্তু আত্মজীবনী সাহিত্য ধারায়

ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য প্রভৃতি সাহিত্য ধারাগুলির সাহিত্যিক গুণও লঙ্ঘিত হয়। তৎসত্ত্বেও আত্মজীবনী সাহিত্য ধারার অবস্থান পৃথক। ছোটগল্পে লঙ্ঘিত হয় কোন ঘটনা, খণ্ড চিত্র-চরিত্র, যাতে ক্রিয়াশীল থাকে লেখকের জীবন ভাবনা ও জীবনচর্যা। আত্মজীবনী সাহিত্যেও বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা, খণ্ডচিত্র-চরিত্র নিয়ে একটি সংহত রূপ লাভ করে অথবা লেখকের বিশেষ কোন ভাবনা জাত তাৎক্ষণিক মুহূর্ত ছোট অথচ নিটোলভাবে রস মূর্তি লাভ করে তখন তার মধ্যে যথার্থ ছোট গল্পের প্রাণ ধর্মই ফুটে ওঠে। তথাপি আত্মজীবনী সাহিত্য আর ছোটগল্প এক নয়। ছোটগল্পকারের মত আত্মজীবনীকারকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি মাত্র ভাব, একটিমাত্র সংকটের সৃষ্টি করে পাঠককে নগদ বিদায় করলে চলেনা। আত্মজীবনীকারের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আপন জীবনের বহমানতাকে প্রদর্শন করা।

উপন্যাসের ব্যাপ্তি, মনুষ্যজীবনের বৈচিত্রময় ব্যাপ্তিরই পরিণত প্রতিচ্ছবি। আত্মজীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা সর্বাংশে সত্য। সে জীবনকে কেন্দ্র করে বিচিত্র ঘটনার ঘনঘটা, সে ব্যক্তিত্বের বৃত্তে ছোট বড় ভালোমন্দ কত চরিত্রের আনাগোনা, নীতি ও আদর্শের জয় পরাজয়ের সুতীব্র দ্বন্দ্বমুখরতা, মনের বিচিত্র সর্পিল গতি, জগৎ সংসারের বহুমুখী আবর্তে উপজাত নানা জটিল মানসিকতা ইত্যাদি সবই উভয়ের মধ্যে লক্ষিত হয়। কিন্তু ঔপন্যাসিককে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হয় এবং সে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার দায়িত্বও তার। আত্মজীবনীকারের মত ঔপন্যাসিক সমকালের আবর্তে আবদ্ধ ও থাকেন। আত্মজীবনাশ্রয়ী উপন্যাসের ক্ষেত্র অবশ্য স্বতন্ত্র। এ জাতীয় উপন্যাসে লেখকের নিজের জীবনই উপন্যাসের উপজীব্য। তৎসত্বেও ঔপন্যাসিক শিল্পী সত্তার উপস্থিতিতে আত্মজীবনীকারের মত ব্যক্তি আমিকে পরিস্ফুট করতে ব্যর্থ হন।

নাটক হল একটি মাধ্যম এখানে অভিনেতাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর মঞ্চস্থ হওয়ার দরুণ জীবনের সকল ভাব ও ঘটনাবৃত্তি উপস্থাপন করা অসম্ভব। আর অনেকক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয় দর্শকের আগ্রহের ওপরও।

কাব্য লেখকের জীবন আদর্শে ও জীবনের ঘটনা প্রবাহ বহনে অনেকাংশে আত্মজীবনী সাহিত্যের সমতুল্য কিন্তু কাব্যেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। স্রষ্টার জীবনের সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহ ও জীবন আদর্শ বহন করতে গেলে কাব্যের কাব্যিক গুণই নষ্ট হবে। নানা পরিচ্ছেদবাহী সুদীর্ঘ গদ্য রচনাশ্রয়ী আত্মজীবনী সাহিত্যে সেই আশঙ্কা থাকেনা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় আত্মজীবনী সাহিত্যধারা এমন এক বিশিষ্ট সাহিত্যধারা সেখানে লেখক নিজের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় প্রদানে অনেক বেশী স্বাধীনতা পান। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তি সত্তার দ্বান্দ্বিকতায় সমকাল যেমন পরিস্ফুট হয় তেমনি ব্যক্তি মানুষের জীবন আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মজীবনী সাহিত্যের এই বিশিষ্ট গুণের সূত্রেই প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে ব্যক্তির চোখে একটি সময়ের সামগ্রিক চালচিত্র ফুটে ওঠে। এখানে একটা কথা বলা জরুরি, আত্মজীবনী সাহিত্য ধারা একটি স্মৃতি নির্ভর সাহিত্যধারা। তাই জীবনের সবটা কখনই আত্মজীবনীতে পরিস্ফুট হয়না। আত্মজীবনীকারের আগ্রহও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকে। আবার সামাজিকতার দায় তাঁকে আত্মগোপনেও বাধ্য করে। যতটুকু বলা শোভন, যতটুকু শালীন ঠিক ততটুকুই বলা। তৎসত্ত্বেও আত্মজীবনী সাহিত্য একজন ব্যক্তিমানুষকে তার সমকালীনতা নিয়ে বুঝতে সাহায্য করে। আত্মজীবনী সাহিত্যের বিশিষ্টতার গুণেই সমগ্র বিশ্বে ইতিহাসচর্চার আধার হিসাবে আত্মজীবনী সাহিত্যধারা বর্তমানে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে আছে। সর্বপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে মানবী বিদ্যাচর্চার উপাদান হিসাবে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবগুণ্ঠনের আড়ালে অবদমিত নারী আত্মজীবনী লিখনের মাধ্যমে নিজের নৈঃশব্দ ভাঙনের চেষ্টাই করেছে। নারীর আত্মজীবনী প্রকৃতপক্ষে সমাজের অর্ধেক ভাগিদারদের দৃষ্টিতে সমাজ, তার নির্মিতিকে নতুন করে দেখবার সুযোগ তৈরী করেছে।

বাংলা আত্মজীবনী সাহিতের ইতিহাসে নারীর আত্মজীবনীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্য জগতে সেই অর্থে আত্মজীবনীর সঠিক কোনও নিদর্শন ছিলনা। মধ্যযুগীয় কবিদের রচনায় ভনিতা অংশে কিংবা জাতক কাহিনীগুলিতে রচয়িতারা নিজেদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাকে আত্মজীবনীর মানদণ্ডে ফেলা যায় না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জমিদার গৃহিনী রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০) *'আমার জীবন'* (১৯৭৬) প্রকাশের মধ্য দিয়েই বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের সূচনা।

তারপর থেকেই সমাজের সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাঙালি নারীরা আত্মজীবনী লিখেতে উদ্যোগি হয়েছেন। সাধারণ গৃহবধূ, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত নারী, অভিনয় জগতের নারীরা, লেখিকা-এমন বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালি নারী আত্মজীবনী লিখেছেন। উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত কতজন বাঙালি নারী আত্মজীবনী লিখেছেন তার সঠিক সংখ্যা আমাদের জানা নেই। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও আত্মজীবনী সাহিত্যের গবেষক চিত্রা দেব তাঁর 'অন্তঃপুরের আত্মকথা' গ্রন্থে উনিশ শতকে জন্মেছেন এবং নিজেদের আত্মজীবনী লিখেছেন, এরকম প্রায় ষাটজন বাঙালি নারীর উল্লেখ করেছেন। বিশ শতকে এসে সেই সংখ্যা যে শতাধিক সহজেই অনুমেয়।

উনিশ শতকের যে সকল বাঙালি নারী আত্মজীবনী লিখতে উদ্যোগি হয়েছিল তাঁরা হলেন- রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০), সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭), কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫), নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৭- ?), মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯৩০), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১), প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৫২-১৯৪০), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯), সুদক্ষিণা সেন (১৮৫৯-১৯৩৪), শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৮৫৯-১৯৩৪), শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৮৬১-১৯২০), শরৎকুমারী দেব (১৮৬২-১৯৪৩), ইন্দিরা দেবী

(১৮৬৩-১৯৩৯), বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪৩), কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯), লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪), সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২), কামিনী রায় (১৯৬৪-১৯৩৩), অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১), রাজলক্ষী দেব্যা (১৮৬৫-?), কমলা বসু (১৮৬৬-১৯৩৯), হেমলতা সরকার (১৮৬৮-১৯৪৩), মৃণালিনী দেবী (১৮৭১-?), সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫), শারদামঞ্জুরী দত্ত (১৮৭২-১৯৫৪), ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০), বিণয়িনী দেবী (১৮৭৩-১৯৩১), হেমলতা দেবী (১৮৭৩-১৯৬৭), সজলনয়না দেবী (১৮৭৪-?), সুচারু দেবী (১৮৭৪-১৯৬৭), সরলা বালা সরকার (১৮৭৫-১৯৬১), কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫-১৯৪৮), সৌদামিনী ধর (১৮৭৬-১৯২২), তিলোত্তমা দেবী (১৮৭৭-১৯০৯), মনোদা দেবী (১৮৭৮-১৯৬৩), রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), মোহিত কুমারী দেবী (১৮৮১-১৯৩১), অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮), পূর্ণশশী দেবী (১৮৮৫-?), মনোরমা দেবী (১৮৯০-?), উমা দেবী (১৮৯২-১৯৭৮), প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯), শান্তা দেবী (১৮৯৩-?), মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯), হেমন্তবালা দেবী (১৮৯৪-১৯৭৬), হরিপ্রভা তাকেদা (১৮৯৪-১৯৭২), আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬), সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪), পূর্ণিমা দেবী (১৮৯৫-১৯৮০), সাহানা দেবী (১৮৯৭-?), স্নেহলতা দেবী (১৮৯৭-?) প্রমুখ।

এদের মধ্যে কোচবিহারে মহারাণী সুনীতি দেবী আত্মজীবনী 'Auto biography of an Indian Pricences' (১৯২১) ইংরেজিতে লিখেছেন।

বিশ শতকের বাঙালি নারী আত্মজীবনীকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— অমিয় বালা দেবী (১৯০০-১৯১৮), শান্তিসুধা ঘোষ (১৯০৭-?), লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭), সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন (১৯০৯-১৯৮১), মণিকুন্তলা সেন (১৯১১-১৯৮৭), বীনা দাস (১৯১১-১৯৮৬), রাণী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭), কানন দেবী (১৯১৬-১৯৯২), প্রতীভা বসু (১৯১৫-২০০৬), শোভা সেন

(১৯২৩), ছবি বসু (১৯২৪-২০১০), রেভা রায়চৌধুরী (১৯২৫), কেতকী দত্ত (১৯৩৪-২০০৩), অনুরূপা বিশ্বাস (১৯৩২-২০১২), জয়া মিত্র (১৯৫০), মীনাক্ষী সেন, বেবী হালদার, তসলিমা নাসরিন (১৯৬২) প্রমুখ।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাঙালি নারীদের আত্মজীবনী থেকে বিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় বাঙালি নারীর জীবন ও মানসিকতার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁদের নিজস্ব বয়ানে। আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মন বাঙালি নারীর আত্মজীবনীর বয়ান থেকে খুঁজে নিতে চায় ইতিহাসের অভিঘাতকে। বিশ শতকের নব নব প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তিত এই সমাজ ব্যবস্থায় বাঙালি নারী নিজেদের কিভাবে খুঁজে পেয়েছেন আমাদের জানবার আগ্রহ জন্মে। জীবন ও সাহিত্যের সমান্তরাল পাঠ *'নারীর আত্মজীবনী'* শীর্ষক আমাদের এই গবেষণা কর্মে সেই আগ্রহ প্রশমনে বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক মধ্যবর্তীকালের পাঁচ নারী আত্মজীবনীকারের আত্মজীবনীকে। লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭), প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬), ছবি বসু (১৯২৪-২০১০), অনুরূপা বিশ্বাস (১৯৩২-২০১২), জয়া মিত্র (১৯৫০) নির্বাচিত পাঁচ নারী আত্মজীবনীকারেরা নিজেদের সময়ের দিক থেকে যেমন বৈচিত্রতা দেখিয়েছেন তেমনি তাঁদের সামাজিক ও কর্ম জীবন বিচিত্রতা দাবি করে।

এখানে উল্লেখ করতেই হয়-লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু, ছবি বসু, অনুরূপা বিশ্বাস, জয়া মিত্র প্রমুখ আত্মজীবনীকারদের আত্মজীবনী নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা ধর্মী কাজ হয়েছে। যেমন আত্মজীবনী সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ও সুলেখিকা ঈসিতা চক্রবর্তী পুলক চন্দ সম্পাদিত *'নারী বিশ্ব'* গ্রন্থে সংকলিত *'অন্দর থেকে বাহির বাহির থেকে অন্দর আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা'* প্রবন্ধে বাঙালি নারীদের আত্মজীবনীতে সমাজ পরিবর্তনের সূত্র ও বাঙালি নারীর আত্মজীবনীর বয়ান সম্পর্কিত অনুসন্ধানে অন্যান্য বাঙালি নারী আত্মজীবনীকারদের সঙ্গে লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু, ছবি বসু, জয়া মিত্রের আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা

করেছেন। অন্য বই *'নৈঃশব্দ ভেঙে ভারতীয় নারী'* বইতেও বাঙালি নারীর আত্মজীবনীর বয়ান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জয়া মিত্রের 'হন্যমান' আত্মজীবনীর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। ওই বইতেই মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় 'না বলা বাণীর ঘনযামিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যান্য বাঙালি নারীদের আত্মজীবনীর সঙ্গে লীলা মজুমদারের *'পাকদণ্ডী'* ও প্রতিভা বসুর *'জীবনের জলছবির'* থেকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ করেছেন।

ছবি বসুর *'ফিরে দেখা'* আত্মজীবনী নিয়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক মফিদুল হক *'নারী মুক্তির পথিকৃৎ'* বই এ *'ছবি বসু ফিরে দেখা জীবনের কিছু চিত্র'* শীর্ষক নিবন্ধে আলোচনা করেছেন। লেখক ব্যক্তিগত পরিচয় এর সূত্র টেনে ছবি বসুর 'ফিরে দেখা' আত্মজীবনীর মধ্যে ছবি বসুর জীবনচর্চা ও মানসিকতাকে ধরতে চেয়েছেন। পরিবেশন করেছেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে ছবি বসুর ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলেখ্য। চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) *'সময়ের উপকরণ: মেয়েদের স্মৃতি কথা'* বইয়ে বাঙালি নারীদের স্মৃতি কথা থেকে সময়ের উপকরণ খুঁজতে লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু, ছবি বসু, জয়া মিত্রের আত্মজীবনীর প্রসঙ্গ টেনেছেন। *'আত্মজীবনীর স্থাপত্য'* বইয়ে সপ্তম অধ্যায়ে লেখক দূর্বা দেব যিনি আমার তত্ত্বধায়কও বটে অনুরূপা বিশ্বাস এর *'নানা রঙের দিন'* আত্মজীবনী ধরে আলোচনা করেছেন। যদিও তিনি *'নানা রঙের দিন'* আত্মজীবনীটির প্রথম পর্বেরই আলোচনা করেছেন। এই সকল গবেষণা ধর্মী কাজগুলিকে মাথায় রেখেই আমরা আমাদের কাজে অগ্রসর হব। আর এক্ষেত্রে এই কাজগুলি আমাদের গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে, একথা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র

১. আশুতোষ রায়, বাংলা আত্মচরিত- সাহিত্যধারা, অরুণা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৪১৪, পৃ: ৭০-৭১।

২. আশুতোষ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১।

৩. ঐ, পৃ: ৭১।

৪. ঐ, পৃ: ৭১।

৫. ঐ, পৃ: ৭১।

৬. ঐ, পৃ: ৭২।

৭. ঐ, পৃ: ৭৫।

৮. রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ)। ১৯তম খণ্ড, পৃ-৩৮০।

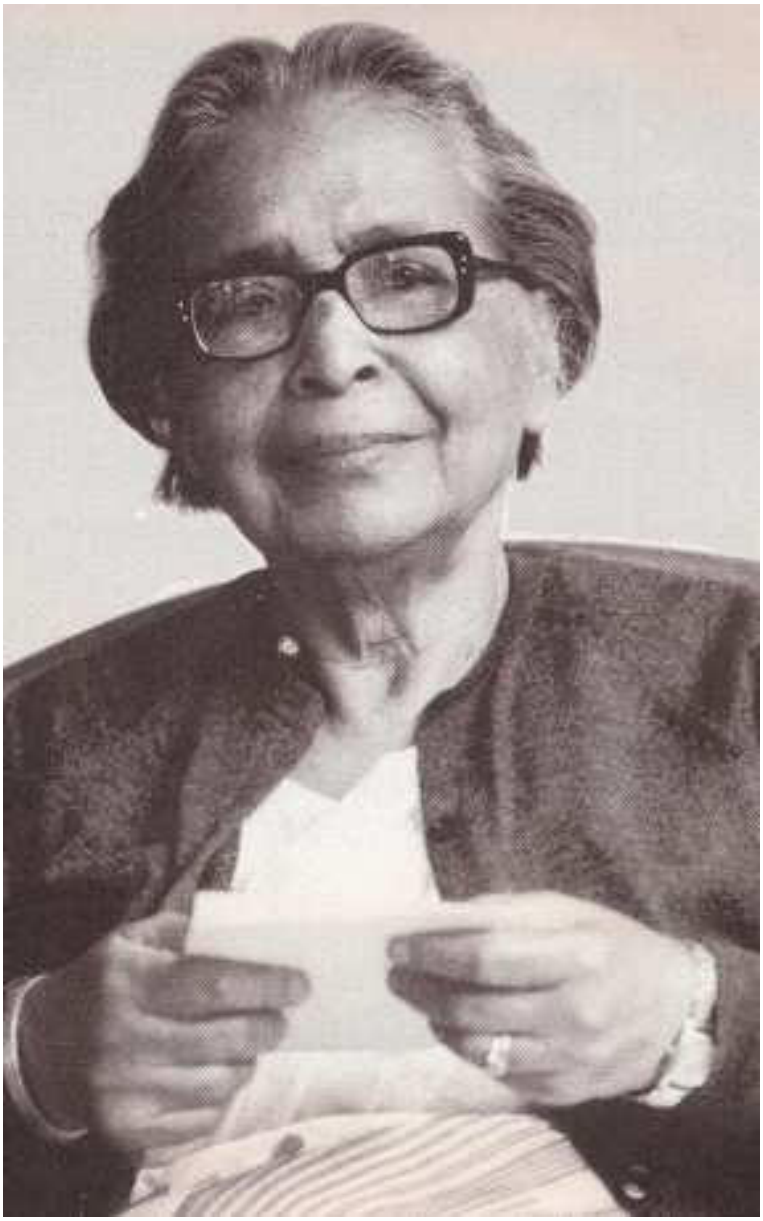

লীলা মজুমদার

(১৯০৮–২০০৭)